মহারাজার তবলা

।। ভূদেব ভগত।।

ডিনঃ
রঁদা, ৰিবিখ্যাত ভাস্কর। কেউ কেউ উচ্চারণ করেন 'ডিন'। রঁদার বিখ্যাত একটি ভাস্কর্য, 'থিংকার'। নিখিল একটু ঝুঁকে বাম উতে ডান হাতের কনুই রেখে, হাতের মুঠো চিবুকে ছুঁইয়ে, হুবহু একেবারে থিংকারের মতোই বসল। কোমরে কেবল ছোট্টবস্ত্র একখানি। সুঠাম কালো চেহারা নিখিলের। উড়িষ্যার ছেলে। আর্ট কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। সরস্বতী পুজো উপলক্ষ্যে আর্ট কলেজে 'গো এজ ইউ লাইক' এর প্রতিযোগিতা হবে। আমরা ঠিক করলাম, উদ্ভট কিছু একটা করে দেখাতে হবে। থিংকারের ভঙ্গিতে ওভাবে বসতে প্রথমে কেউই রাজী হলো না। কারণ, যে বসবে, তাকে মাটি দিয়ে ঢেকে ফেলা হবে। উড়িষ্যার নিখিল শেষমেষ রাজী হলো। ভাস্কর্য ক্লাসের চাকা লাগানো টুলটার ওপর নিখিল বসল। আমরা পটাপট নিখিলকে আপাদমস্তক মাটি দিয়ে ঢেকে ফেললাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই নিখিল রঁদার 'থিংকারে' পরিণত হলো। কলেজের প্রাঙ্গনে ওদিকে প্রতিযোগিতা আরম্ভহয়ে গিয়েছে। চাকা লাগানো টুলখানা ঠেলতে ঠেলতে আমরা হাজির হলাম প্রতিযোগিতার মাঠে। সকলেই হতবাক। বিচারক দলের মুখেও কথা নেই। একী ব্যাপার, মাটির একটি মূর্তি প্রতিযোগিতায় কেন! একটু পরেই বিচারকরা বুঝে ফেললেন ব্যাপারটা। মাটির ভেতরে এদিকে নিখিল বেচারা ঠান্ডায় ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। মূর্তিটাও মাঝে মাঝে নড়ে উঠছে। অন্যরা কেউ সেজেছে জাপানী, কেউ পাঞ্জাবী, কেউ ফুচকাওয়ালা, কেউ পর্যটক। একটু পরেই প্রথম পুরস্কার ঘোষণা হলো। আমাদের 'থিংকার'ই পেয়েছে প্রথম পুরস্কার। কানের কাছে মুখ নিয়ে নিখিলকে সুখবরটা দিলাম। আনন্দ চাপতে না পেরে নিখিল দুপাশে দুহাত ছড়িয়ে, মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে পড়ল। নিখিলের তখল খেয়াল নেই, ওর পরনে এক চিলতে নেংটি ছাড়া আর কোনো কার্পাস নেই। মাটিমাখা শরীর নিয়ে প্রায় উলঙ্গ নিখিল শু করল দৌড়। দৌড়তে দৌড়তে কলেজের পেছনের দিকের পুকুরে ঝাঁপ।

অঙ্কুমহারাজ ঃ
নামটা আমিই দিয়েছিলাম ওকে। ওর আসল নামটা যে কি ছিল, আজ আর মনে পড়ে না। অসল নামটা হারিয়ে গিয়েছে মানুষটা কিন্তু হারায়নি। পৃথিবীর নিয়মিত সমস্যা যতই থাকুক, স্মৃতি মানুষের পিছু ছাড়ে না। কিছু স্মৃতি হারিয়ে যায়। রং হারিয়ে কিছু স্মৃতি সাদাকালো হয়ে বেঁচে থাকে মনের কোণে। কারো কারো চেহারা সঠিক মনে পড়ে না। বিমূর্ত হয়ে থেকে যায় মস্তিষ্কে। চুনীদা, জ্ঞানদা, মধুদা, সত্যেনদা, হিরণদা, নৃপেন, মৃণাল, জ্যোতির্ময়, অশোক, অলোক, মুকুল, স্বপন, প্রবোধ, অর্পিতা, সনৎ, বাণী, মঞ্জুলা, জনা, ভারতী এদের কিছু কিছু চেহারা মনে পড়ে, আবার মনে পড়েও না। অঙ্কুরের আসল নামটাই তো মনে পড়ে না। কিছু সাদাকালো স্মৃতি জৌলুস হারাতে হারাতে ধূসর হয়ে যায়। কিছু কিছু মানুষ নতুন ভাবে রঙিন হয়ে ফিরে ফিরে আসে। হঠাৎ দেখা হয়ে যায় কারো কারো সাথে, জীবন - চলার পথে। এই স্মৃতি নিয়েই মানুষের ছবি, গান, কবিতা, সাহিত্য আর কাহিনী।
অঙ্কু একা একাই থাকতে ভালোবাসতো। ক্যান্টিনে বসে চায়ের কাপ সামনে নিয়ে, মাঝে মাঝে সে পালুষ্করের গান গুনগুন করে গাইতো। বেশ একটা খানদানী আমেজ ছিল অঙ্কুর গলায়। ঐ গানের টানেই অঙ্কুর সাথে আমার আলাপ। পরে জানলাম, অঙ্কু ভালো নাচতেও পারে। ধীরে ধীরে আমাদের সঙ্গে ওর হৃদ্যতা জমে উঠলো। আমাদের একটা ছোট দল গড়ে উঠেছিল আপনা আপনিই। ছুটির দিনগুলোতে সকলে মিলে কখনো গঙ্গার পাড়ে, কোনোদিন যাদুঘরের ভেতরে, কখনো নিউ মার্কেটের মধ্যে, কখনো হাওড়া ষ্টেশনের চত্বরে, আবার কখনো বা ময়দানে আমরা ছবি আঁকার অভ্যাস করে বেড়াতাম। অঙ্কুও আমাদের ঐ দলে থাকতো।

একদিন আবিষ্কার করে ফেললাম, অঙ্কু বিগত দিনের বিখ্যাত তবলিয়া কণ্ঠে মহারাজের প্রপৌত্র। এবং স্বনামধন্য কত্থক নৃত্যশিল্পী বিরজু মহারাজের কাছে নাচ শেখে। এই আবিষ্কারের পরেই ওর নাম দেওয়া হয়েছিল অঙ্কুমহারাজ। আশ্চর্য! ঐ নামটাই স্মৃতির কোঠায় রয়ে গেছে। আসল নামটা যে কি ছিল, অনেক ভেবেও মনে করতে পারি না।

শুনেছি কণ্ঠে মহারাজের না, ধি, ধি, না, শুনে শ্রোতাদের নাকি তাক লেগে যেত। পুরনো দিনের সঙ্গীত রসিকেরা বলতেন, তবলাতে ওরকম মুক্তোর দানার মতোন পরিষ্কার বোল নাকি আগে শোনা যায়নি। মনে মনে ভাবি, না জানি কি যাদু কি কণ্ঠে মহারাজের আঙুলে!

অঙ্কু ছিল বেশ চাপা ছেলে, তাই অনেক সময় লেগেছিল পেছনের পাতা ওল্টাতে, ওর সঙ্গীত ঘরানার ইতিহাস আবিষ্কারকরতে। আমরা একদিন মহাজাতি সদনে দেখলাম কণ্ঠে মহারাজকে, তাঁরই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে। প্রায় নববই ছুঁই ছুঁই তখন তাঁর বয়েস। পুত্র নান্কু মহারাজ এবং পরমাত্মীয় কিষাণ মহারাজ ও বিরজু মহারাজের হাত ধরে সেদিন তিনি উঠে এসেছিলেন মঞ্চে। অনেক অনুনয়ে অঙ্কুকে রাজী করিয়ে একদিন অঙ্কুর সাথে পৌঁছে গেলাম কণ্ঠে মহারাজের বাড়িতে। প্রথমে অবশ্য তেমন পাত্তা পাইনি। বেশ কয়েকবার যাতায়াতের পর, বৃদ্ধ কণ্ঠে মহারাজের আমাকে ভালো লাগতে আরম্ভ করল। বিশেষ করে যখন উনি জানলেন যে, আমিও তবলার ভক্ত। একদিন বসে বসলাম, আমি আপনার কাছে তবলা শিখব। আপনার হাতে শুনেছি যাদু আছে। যদিও জানি, আজকাল উনি বাজাতে পারেন না, তবু আমার কথায় বৃদ্ধের আঙুলগুলো একটু যেন নড়ে উঠলো। নীল নীল শিরা উপশিরাগুলোর মধ্যে এক কালের তাক লাগানো ব্যাপারটা খোঁজার চেষ্টা করলাম। বাড়িতে জোড়ায় জোড়ায় তবলা বাঁয়ার ছড়াছাড়ি। একজোড়া টেনে নিয়ে বললেন ‘দেখি বাজাও’! ভয়ে ভয়ে বাজালাম, যতটুকু জানি। হারানো কালের দিকপাল একজন তবলিয়ার পায়ের কাছে বসে বাজানোটাও পরম সৌভাগ্যের। বাজনা শুনে খুশি হয়ে জানতে চাইলেন, কার কাছে শিখেছি। বললাম, জামশেদপুরে বাড়ি আমার। সেখানে আমার গু ছিলেন শ্রীকেশব চক্রবর্তী। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর উনি বললেন, “শোন, টালিগঞ্জে যাবে, সিদ্ধেশ্বরবাবুর বাড়ি খুঁজে বার করবে, সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, সকলেই চেনে, সিদ্ধেশ্বরবাবুর বাড়ি চার পাঁচখানা বাড়ি ছেড়ে ফণিবাবুর কাছে যাবে, আমার নাম বলবে, যাও আরম্ভ কর তালিম।” তারপর উনি তাঁর পুরনো দিনের সংগ্রহ থেকে খয়ের কাঠের প্রকান্ডএকখানা তবলা আমায় উপহার দিয়ে বসলেন। ঐ মহামূল্য উপহার বগলে করে মহানন্দে আমি সেদিন হস্টেলে ফিরে এলাম।

গ্রামোফোনঃ

পরবাসী ছাত্রদের জন্য প্রথম দিকে আর্ট কলেজের কোনো হস্টেল ছিল না। সব কলেজেই দু-এক জন নেতা থাকে। ঐ রকম এক নেতার দুঃসাহসিক উদ্যোগে, কলেজ ক্যান্টিনের ডাইনিং হলের ওপরতলার হলঘরটা দখল করে, আমরা থাকতে আরম্ভ করেছিলাম। প্রায় একশো বছরের পুরনো কলেজ আমাদের। কলেজের মাঝখানের বাগানে বিশাল বিশাল নিম, শিমূল, অশত্থগাছ। আমাদের পূর্বপুষ কিছু হনুদম্পতি তাদের ছানাপোনা নিয়ে গাছে ডালে ডালে ঘুরেও বেড়াতো। মুখ ব্যাজার করে পেট চুলকাতো আমাদের দেখে। ছায়াঘন ভয় ভয় পরিবেশ। এখানে ওখানে ছাত্রদের তৈরি নানা মূর্ত বিমূর্ত ভাস্কর্য ছড়ানো। ঐ মায়াময় ছায়া পেরিয়ে আমাদের হস্টেল, অর্থাৎ ক্যান্টিন। সন্ধের পর গা ছমছম করতো ঐ ছায়া পেরিয়ে হস্টেলে যেতে। বৃদ্ধ দয়ারাম দারোয়ান নাকি গভীর রাতে বেশ কয়েকবার সাহেব ভূতেরও দেখা পেয়েছে। আমরাও মাঝরাতে কখনো কখনো শুনতাম ঠুকঠাক নানা আওয়াজ। পাশেই যাদুঘর। মমি টমিরা হাঁটা চলা করতো কি না কে জানে! বেশিদিন অবশ্য আমাদের থাকা হল না চৌরঙ্গীর মতোন জায়গায়। কলেজ কর্তৃপক্ষ আমাদের হটানোর নানা চেষ্টা করতে লাগলেন। শু হলো হরতাল, ঘেরাও এবং সবশেষে ভাঙচুর। অবশেষে অনশন ইত্যাদির পর, তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী ও রামকৃষ্ণ মিশনের বদান্যতায়, জোড়াসাঁকো অঞ্চলে যদুলাল মল্লিক রোডের ওপর একটি চারতলা বাড়ির তিনতলায় এবং চারতলায় হলো আমাদের স্থায়ী হস্টেল। আমার ঘরটি ছিল চারতলায়, কোণের দিকে। একটি টানারিক্সাতে বাক্স, বিছানা, ইজেল - ক্যানভাস এবং মহারাজার তবলা বোঝাই করে চৌরঙ্গী থেকে সেদিন পৌঁছেছিলাম জোড়াসাঁকোর হস্টেলে। রিক্সাভাড়া তিনটাকা। সালটা ছিল ঊনিশশো তেষট্টি।

আজকাল যেমন একটা জিনিস কিনলে আর একটা জিনিস ফ্রিতে পাওয়া যায়, আমরা ঐ হস্টেলবাড়িটির একটি ঘরে

পেয়েছিলাম একটি পরিত্যক্ত গ্রামোফোন। কিছু মর্চেপড়া পিন আর কয়েকটা রেকর্ডও পড়েছিল। রেকর্ডগুলো প্রায় সব কটিই ভাঙা। একটিই কেবল আস্ত ছিল। পাহাড়ী সান্যালের গাওয়া "শ্রীকৃষ্ণ নাম মোর জপমালা নিশিদিন, শ্রীকৃষ্ণ নাম মোর ধ্যান"। মেগাফোন কোম্পানি ১৯৩৮ সালে বার করেছিল রেকর্ডটা। আর এক পিঠে কি গান ছিল আজ আর মনে নেই। কেন গ্রামোফোনটা ফেলে চলে গিয়েছিল, বোঝা গেল, দম দিয়ে ওটা চালাতে গিয়ে। বাজাতে গিয়ে দেখা গেল গান বার হচ্ছে খুবই মোটা গলায়, কিন্তু এ কার গলা? এতো পাহাড়ী সান্যাল নয়! একটু পরে দেখা গেল রেকর্ডের স্পিড বেড়েই চলেছে ক্রমাগত। বাড়তে বাড়তে শেষের দিকে গান শেষ হলো কিচির মিচির পাখির ডাকে। ফ্রিতে পাওয়া গ্রামোফোন। ফেলেও দেওয়া যায় না। আমরা চেষ্টা করতাম, গান যখন মোটামুটি ঠিক স্পিডে পৌঁছে গেছে, তখন আঙ্গুলের চাপে ঐ স্পিড ধরে রাখতে। চাপ একটু এপাশ ওপাশ হলেই, পাহাড়ীবাবু হয়ে যেতেনকখনো বা সায়গল, কখনো বা কমলা ঝরিয়া।

।। আঁচড় ।।

ভাস্কর্য্য বিভাগের ছাত্র ছিলেন শ্রীহরভূষণ মল। খড়গপুরের ছেলে। একদিন দেখি ঠেলাগাড়িতে করে হরদা বিশাল একখানা গোলাকার পাথর গঙ্গার পাড় থেকে নিয়ে এলেন কলেজে। পাথরটিকে স্থাপন করা হলো কলেজের বাগানে। তারপর হরদা শু করলেন পাথরটার চারদিক ঘুরে ঘুরে ছেনি হাতুড়ির ঠুকঠাক। ঐ মস্ত গোল পাথরটা দিয়ে উনি কি গড়বেন জানতে চাইলে, মালবাবু কেবল মুচকি হাসেন। ছেনি হাতুড়ির ঠুকঠাক চলল প্রায় দুমাস। একদিন অবাক হয়ে আমরা আবিষ্কার করলাম, পাথর থেকে বেরিয়ে এসেছে গাবদা গাবদা দুই পালোয়ান। কুস্তি করছে দুজনে। গঙ্গার পাড়ে পড়ে থাকা পাথরখানা দেখে তার ভেতরে হরদা অনেকআগেই দেখে ফেলেছিলেন দুই পালোয়ানকে। আমাদের ভোঁতা চোখ যা দেখতে পেলো অনেক পরে।

আমরা পথেঘাটে মাঠে-ময়দানে ছবি আঁকা অভ্যাস করে বেড়াতাম পাগলের মতোন। একবার হস্টেলের ছাদে উঠে মস্ত একখানা ক্যানভাসে তেল রঙে একটা ছবি আঁকছি। মনে মনে বিষয় ঠিক করেছিলাম, কলকাতার কংক্রিট জঙ্গল। মধুদা মাঝে মাঝেই এসে দাঁড়াতেন পেছনে। আমি তখন দ্বিতীয় বর্ষে আর মধুদা তখন ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। অভিজ্ঞ চোখ দিয়ে কেবল দেখতেন। কিছু বলতেন না। একদিন হঠাৎ আমার হাত থেকে ব্রাশখানা চেয়ে নিয়ে ছবির ছোট্ট একটুখানি জায়গা নিজের হাতের দু-একটি আঁচড়ে ঠিকঠাক করে দিলেন। ছবিখানা যখন কলেজে নিয়ে গিয়ে আমার শিক্ষক মহাশয়কে দেখালাম, তিনি সমস্ত ছবিটা এক ঝলক দেখে নিয়েই আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, "এই যে এই জায়গাটা, কে করেছে বলতো? তুমি তো করনি মনে হচ্ছে!" শিক্ষক মহাশয়ের তীক্ষ্ম চোখ এক লহমায় ধরে ফেলেছে অভিজ্ঞতার আঁচড়। যে আঁচড় আমার মনে আজও মলিন হয়ে যায়নি।

।। কাজীসাহেব।।

ফণিবাবু আপত্তি করেননি কণ্ঠে মহারাজের নাম শুনে। ফণিবাবুর সূত্র ধরে আলাপ হয়েছিল অনেক গুণী ব্যক্তির সঙ্গে। এমন কি ওস্তাদ কেরামতুল্লা খানের কাছেও তালিম নেওয়ার সুযোগ হয়েছিল। একদিন আলাপ হলো আকাশবাণীর শিল্পী নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তিনি হলেন স্বনামধন্য কৌতুক অভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহধর্মিনী। থাকতেন টালিগঞ্জেরই চা এভিনিউতে। একদিন ওঁদের বাড়িতে আমরা বসে গান বাজনা করছি, হঠাৎ নীলিমাদি বললেন, "কাজীসাহেবের বাড়ি যাবি?" চোখে মস্ত একটা জিজ্ঞাসার চিহ এঁকে আমি হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম নীলিমাদির মুখের দিকে। নিউ থিয়েটার্সে শ্যুটিংএ যাওয়ার জন্য তৈরি হয়েভানুদা বেরোচ্ছিলেন। আমার ওরকম জিজ্ঞাসার চিহমার্কা চেহারা দেখে, শরীর বেঁকিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন, "পেলিকেনেরমতো হাঁ করে আছিস কেন হতভাগা, কাজীসাহেবকে চিনিস না? কাজী নজল ইসলাম। আগামীকাল ৯ই জ্যৈষ্ঠ, ওনার জন্মদিন। আমরা সবাই যাবো। রবিও যাবে। কাজী সাহেবকে তো চিনিস না। রবিকে চিনিস তো? রবি ঘোষ। অনুভাও যাবে। কাল সক্কাল সক্কাল চলে আয় ছোনো পাউডার মেখে। তোর নীলিমাদির গান হবে। তুই বাজাবি সঙ্গে। এমন সুযোগ আর পাবি না রে এ জন্মে!"

আমি আশর্চ্য তখনও। কাজী নজল ইসলামকে দেখবো, এই ভাবনাতে নিশ্চুপ। মনে পড়ছে একদিন ভানুদাই শুনিয়েছিলেন বিখ্যাত একটি গান সৃষ্টির নেপথ্য কাহিনী। একজন পূজারিনী তার পুজোর থালাতে পরম ভক্তিভরে একগুচ্ছ

রক্তজবা নিয়ে চলেছিলেন কালী প্রতিমার দিকে। এমন দৃশ্য আমরা অনেক দেখি। হয়তো কাজী সাহেবও দেখেছেন বহুব ার। কিন্তু সেদিন কে জানে কী বিদ্যুৎ খেলে গেল, জন্ম হলো বিখ্যাত সেই গান "বলরে জবা বল, কোন্ সাধনায় পেলি শ্যামা মায়ের চরণতল...'

পরদিন আমরা সবাই মিলে দুখানা অ্যামবাসাডরে বোঝাই হয়ে পৌঁছলাম কাজী নজল ইলসামের বাড়ি। উনি তখন পুত্রকাজী অনিদ্ধর সঙ্গে পাইকপাড়াতে থাকতেন। ইতিমধ্যে বহু জ্ঞানী গুণী সিনেমা শিল্পী, থিয়েটার শিল্পী, গায়ক গায়িক া হাজির হয়েছেন কাজী নজল ইসলামকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে। কাজীসাহেব ঘরের এক পাশে বসে রয়েছেন নতুন পোশ াকে, তাঁর জন্য সজ্জিত আসনে। কপালে চন্দন, গলায় সাদা ফুলের মালা। পা দুখানি ঢেকে গিয়েছে ভক্তজনদের দেওয় া ভালোবাসার ফুলে ফুলে। কবি কিন্তু নির্বিকার। আগুনের ভাঁটার মতোন দুটি চোখ এপাশ ওপাশ ঘোরাফেরা করছে। পত্রবধূরা সমানে পুরনো খবরের কাগজ এগিয়ে দিচেচন কাজীসাহেবের হাতে। তিনি সেগুলো ছিঁড়ে চলেছেন আপন মনে। মস্তিষ্কে সামান্য যে অনুভূতিটুকু এখনও জীবিত আছে, তাতে শুধু ঐ একটি কাজই তিনি করতে পারেন। অ ার সব নিরাকার, ব্রহ্ম। এতো অজস্র গানের রচয়িতা, সুরকার আজ স্তব্ধ। একটু পরে কাজী সব্যসাচী 'বিদ্রোহী' কবিতা টি পাঠ করলেন বাবার পাশে দাঁড়িয়ে। আমি মুগ্ধ চোখে চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম, কাজী নজল ইসলামের হাতের মুঠোর ভাষা মাঝে মাঝে বদলে বদলে যাচ্ছে, কবিতার কোনো কোনো শব্দের শক্তিতে। হয়তো সূক্ষ্ম কোনো প্রাণ এখনও অবশিষ্ট রয়েছে তাঁর মৃত মস্তিষ্কে। নিয়তির কি নিষ্ঠুর পরিহাস! নীলিমাদি সেইদিন গাইলেন "গানগুলি মোর আহত পা খির সম, লুটাইয়া পড়ে তব পায়ে প্রিয়তম।"

।।সাপ।।

এতোদিনে নতুন অধ্যায় লেখা হয়ে গেছে বাংলা সিনেমার ইতিহাসের পাতায়। সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী' বিজয় করে ফেলেছে। মিউজিয়ম অব মডার্ন আর্ট, নিউইয়র্কে ছবিটির আন্তর্জাতিক উদ্বোধন হয়েছিল প্রথম। আমাদের গোটা দল একদিন 'পথের পাঁচালী' দেখে এলাম মুগ্ধ চোখে। বিখ্যাত পরিচালক কুরোশাওয়া এই ছবি দেখে নাকি বলেছেন, "যে মানুষ 'পথের পাঁচালী' দেখেনি, সে সূর্যোদয় দেখেনি।" শুনেছিলাম 'পথের পাঁচালী'র বেশ কিছু শ্যুটিং হয়েছিল বোড়াল গ্রামে। বালিগঞ্জ থেকে ট্রেনে চেপে একদিন সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লাম বোড়াল গ্রাম দেখার জন্যে। সারা গ্রাম ঘুরে ঘুরে বুঝলাম না কিছুই। কোথায় পুকুর, কোথায় কাশবন, কোথায় ট্রেন! ঐ কাঁচা বয়েসে কী জানতাম, কোথাকার কোন্ দৃশ্য, কোথায় কী ভাবে জুড়ে জুড়ে ছবি তৈরি হয়! একদিন হঠাৎ সুযোগ এলো সত্যজিৎ র ায়ের সঙ্গে আলাপ করা। আলাপের সূত্র ছিল একখানি পাইথন সাপ।

কোনো এক বার্ষিক প্রদর্শনীর সময় সুমন নামে একটি ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। হাঁটা চলায় বনেদি আলোড়ন। ঠোঁটে অমায়িক হাসি। যেন শেষের কবিতা'র অমিত। ক্যান্টিনে বসে চা খেতে খেতে সুমন তার পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটি জ্যান্ত সাপ বার করে দেখাল। সাপ দেখে আমাদের সবার চোখ কপালে। সুমন বলল, এটা হলো 'বেবি প াইথন'। অবিচল চিত্তে সাপটি নিয়ে নানাচাড়া করতে করতে সুমন জানালো, বাড়িতে তার একটা ছোটো চিড়িয়াখানা আছে। সেখানে এরকম আরও অনেক কিছু রয়েছে। একদিন আমি ওদের বাড়ি গেলাম, ওর চিড়িয়াখানা দেখতে। ওদের একটা মিষ্টির দোকান ছিল রাসবিহারীর মোড়ে। নাম ছিল 'মধুক্ষরা'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেওয়া নাম। মিষ্টির দোকানের কর্মচারী ছেলে - ছোকরার দল পাইথন সাপটির জন্য প্রজাপতি, টিকটিকি, ফড়িং ইত্যাদি ধরে ধরে এনে দিত। পরিবর্তে সুমন ওদের প্রতি টিকটিকি বা ফড়িং বাবদ এক আনা করে দিত পারিশ্রমিক হিসেবে। ময়ূর, কাকাতুয়া, লরিস, মাউস-ডিয়ার (ছোটো জাতের হরিণ) আরও অনেক কিছু ছিল ওর সখের চিড়িয়াখানায়। কথায় কথায় বেরিয়ে পড়ল, মানিকমামার 'চিড়িয়াখানা' সিনেমাতে এই পাইথন সাপটিই দেখানো হয়েছিল উত্তমকুমারের হাতে। ম ানিকমামার নামশুনেই হৃদকম্প শু হলো আমার। জানা গেল, মানিকমামা অর্থাৎ সত্যজিৎ রায় সুমনের মামা। ব্যাস - একদিন সুমনকে সঙ্গে নিয়েহাজির হলাম সত্যজিৎবাবুর তিন নম্বর লেক টেম্পল রোডের বাড়িতে। তখন তিনি ওখ ানেই থাকতেন। আলাপ হলো। পরিচয় হলো। ঐ সময় তিনি ব্যস্ত ছিলেন 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ছবির কাজে। ব্যস্ত কাজের ফাঁকেও তিনি নানা কথা বলতেন এবং নানা কথা জানতেও চাইতেন। শ্যুটিং দেখতে চাইলাম একদিন, সাহস করে। মনিকদা হেসে ছোট্ট একটি চিরকূটে নিজের সেই বিখ্যাত 'সই' খানা করে, দিলেন আমার হাতে। বললেন, নিউ

থিয়েটার্সের গেটে দেখালে ছেড়ে দেবে। দুনম্বর ফ্লোরে চলে আসবে। ছবি তোলার কথা জানতে চাইলে বললেন, 'তুলতে পারো, ফ্ল্যাশ জ্বলবে না'। পর পর বেশ কয়েকদিন শ্যুটিং দেখার সৌভাগ্য হলো। পাশে, এক নম্বর ফ্লোরে চলছিল তপন সিন্‌হার 'পরিণীতা'র শ্যুটিং। 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'এর একটি দৃশ্য ছিল, গুপী আর বাঘা জেলে বন্দী, তালি মেরে ওরা প্রচুর ভালো ভালো খাবার আনিয়েছে ভূতের রাজার কাছ থেকে। ক্ষুধার্ত দারোয়ান নৃপতি চ্যাটার্জী, অত ভালো ভালো খাবার দেখে, লোভ সামলাতে না পেরে, জেলখানার গেট খুলে ঢুকে পড়বে। ঐ সুযোগে গুপী বাঘ া জেল থেকে পালাবে। গ্রান্ড হোটেল থেকে স্পেশাল মাংস, পোলাও, মস্ত মস্ত রসগোল্লা, সন্দেশ ইত্যাদি আনানো হয়েছিল শ্যুটিং-এর জন্য। আমাদেরও জিভে জল এসে গিয়েছিল ঐসব দেখে।

শ্যুটিং - এর প্রস্তুতিতে ঘন্টা চারেক লাগিয়ে দিয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়। পরে জেনেছিলাম, ঐ দেরী ছিল ইচ্ছাকৃত। অ ারর দারোয়ন নৃপতি চ্যাটার্জীকে সকাল থেকে রাখা হয়েছিল অভুক্ত। কারণ দারোয়ানের ক্ষুধার্ত লোভী চেহারাটিও দরকার ছিল সত্যজিৎ রায়ের। খিদের চোটে নৃপতি চ্যাটার্জী জেলখানার দরজা খুলে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলেন খাব ারের ওপর। আলাদা করে অভিনয় আর করতে হয়নি নৃপতিবাবুকে। শ্যুটিং -এর শেষে, ঐ সব খাবার অবশ্য আমরা সবাই ভাগ করে খেয়েছিলাম।

ফ্ল্যাশ জ্বালতে কেন নিষেধ করেছিলেন পরে বুঝেছিলাম। অনেক সময় তিনি শিল্পীদের বলতেন 'মনিটার', অর্থাৎ রিহ ার্সাল হচ্ছে, ছবি তোলা হছে না। অথচ তিনি ছবি তুলে নিতেন শিল্পীদের জানতে না দিয়ে। বহুক্ষেত্রে ঐ অভিনয়, বলে করানো অভিনয়ের থেকে অনেক স্বাভাবিক হতো। এমন বহু উপস্থিত বুদ্ধি তিনি ব্যবহার করতেন। তবেই না অস্কার বিজেতা!

সত্যজিৎ রায়ের সই করা সেই ছোট্ট চিরকুটখানা আজও রাখা আছে স্বযত্নে।

।। চন্দ্রমল্লিকা ।।

আর্ট কলেজের পাঠ একদিন শেষ হলো। ফিরে এলাম নিজের শহরে। জিনিসপত্রের বোঝায়, কণ্ঠে মহারাজের উপহার দেওয়া তবলাখানা সঙ্গে করে আনা হলো না। ভেবেছিলাম পরে কখনো গিয়ে নিয়ে আসবো। আর যাওয়া হয়নি। মেঘে মেঘে বয়ে গেল অনেকগুলো বছর। জীবিকার স্রোতে, বন্ধুরা কে কোথায় ছড়িয়ে পড়ল কে জানে! অনেক ঠিকানা হারিয়েছ গেল, অনেক নাম মুছে গেল, অনেক চেহারা আবছা হয়ে গেল, অনেক স্মৃতি তলিয়ে গেল। চোখে চশমা উঠলো, চুলে পাক ধরল, অতিক্রান্ত হয়ে গেল জীবনের অনেকখানি পথ। চিঠির বাক্সে হঠাৎ একদিন একখানা অ ামন্ত্রণপত্র পেলাম। চমকে উঠলাম। আর্ট কলেজের বার্ষিক উৎসবউপলক্ষ্যে বিশেষ আমন্ত্রণ। কী ভাবে কে বা কারা ঠিকানা পেয়েছিল, জানি না। মনে মনে হিসেব কষে দেখলাম, প্রায় চল্লিশটা বছর পেরিয়ে এসেছি। আর্ট কলেজের অ াকর্ষণ উপেক্ষা করা সম্ভব হলো না। গেলাম। উৎসব অনুষ্ঠানে অনেক পুরনো বন্ধু-বান্ধবীদের সাথে দেখা হলো। কারো কারো চেহারা আমূল বদলে গেছে। আবার কেউ কেউ তেমন বদলায়নি। সময় এক একজনকে এক এক রকম ভাবে সে াহাগ জানায়। অঙ্কুরের কোনো সন্ধান পেলাম না। কেউ কিছুই বলতে পারলো না। নতুন যুগের উদ্যোগী ছাত্রছাত্রীরা, অনেককেই আমন্ত্রণ করে ডেকে এনেছে। ভালো লাগলো ওদের আতিথেয়তা। দু-একজন সহপাঠী, এখন এই কলেজেরই শিক্ষক-শিক্ষিকা। প্রায় সকলেরই বিয়ে-শাদি, ছেলে-পুলে, নাতি-নাতনি হয়ে গেছে। কিছু অপঘাত, অঘটন, হার্ট অ্যাটাক, ডাইভোর্স, ক্যান্সার ইত্যাদির দুঃসংবাদও পেলাম। দু'একজন চিরকুমার, চিরকুমারীর সঙ্গেও দেখা হলো। জীবন এগিয়ে চলে তার নিজের হিসেবে, তবু মানুষসারাজীবন হিসেব খুঁজে ফেরে।

মুকুল আমায় চিনতে পারেনি। না পারারই কথা। সেই উনিশশ বাষট্টি সালে আমরা আর্ট কলেজে ঢুকেছিলাম পায়ে হেঁটে, সংশয়ে, সংকোচে। পাশ করে বেরোলাম সাতষট্টিতে। চোখ দিয়ে হেঁটে ঝিটাকে দেখতে শিখলাম। মা বাবা যেমন ছোটো বয়সে পোলিও ড্রপ দিয়েছিলেন পরম স্নেহে, উৎকণ্ঠায়; আর্ট কলেজও তেমননি করে আমাদের শিখিয়েছিল সমাজে, পৃথিবীতে সোজা হয়ে হাঁটতে, অন্য এক পরিচয় নিয়ে।

বেশ কিছু পুরনো ছাত্র ছাত্রী আসেনি খবর পাওয়া সত্ত্বেও। ওরা ভুলে গেছে ওদের সেই স্নেহ-সম্বলকে।

মুকুলকে আমি দূর থেকেই চিনলাম। মুকুল ছিল উত্তর বিহারের সাধারণ ঘরের ছেলে। বাংলা বলতে তার অসুবিধা হতো। ছবি আঁকা শেখার অদম্য ইচ্ছা, কলকাতায় তাকে টেনে এনেছিল। টেনে এনেছিল আমার কাছাকাছি। স্কুলের

বন্ধু প্রণবের বাড়িতে থেকে পরীক্ষা দিয়েছিলাম। পরীক্ষার্থী ও পরীক্ষার্থিনী ছিল প্রায় দেড় হাজার। আসন ছিল মাত্র পঞ্চাশটি। আমরা জায়গা পেয়েছিলাম ঐ পঞ্চাশজনের মধ্যে। মুখচোরা মুকুলের সঙ্গে আলাপ হলো। আমিও বিহারের, তাই - 'মিলে গেল এসে'।

অন্য বন্ধুরা দেখলাম চেহারায় অনেকেই অনেক বদলেছে। সহপাঠি আলোকের মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে, মনে মনে তার দাড়ি, গোঁফ ছেঁটে ফেললাম, চুল ছোটো করে ফেললাম, ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো সাতষট্টির আলোক। যারা হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলতো, তাদের হাত নাড়া বেড়েছে। যারা মাথা ঝুঁকিয়ে অমায়িক সুরে বলতো, তাদের বিনয় আরও ঝুঁকে গিয়েছে যারা তাড়াতাড়ি কথা বলতো, খৈ ফুটতো, তাদের বলার গতি বেড়ে গিয়ে, দু-চার শব্দের মাঝে এক একটি শব্দ এখন উধাও।

'পুরানো সেই দিনের কথা' মনে করে অবিরাম স্মৃতিচারণ করতে করতে সহপাঠিনী মঞ্জুলার মিষ্টি গলাটাই বসে গেল। শেষকালে এক একটি শব্দের শুধু একটি করে অক্ষর কোনোত্রমে আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম। তবু তাকে থামায় কার সাধ্য! মঞ্জুলার খুব ইচ্ছে ছিল রবিবাবুর ঐ বিখ্যাত গানটি মঞ্চে উঠে গাইবে, তা আর হলো না।

এক রসিক বন্ধু এসেছিল সস্ত্রীক, বললো, বিয়ের যাঁতি এখন কাজে লাগছে ব্লাড প্রেসারের ওষুধ অর্দ্ধেক করতে। ডাক্তারবাবু বলেছেন অর্দ্ধেকটা খেতে। সে ওষুধ এমনই শক্ত যে আঙুলের চাপে ভাঙতে চায় না।

আর এক বন্ধুনীর হাতে দেখলাম লাঠি। তবু সে আর্ট কলেজের মোহ প্রাঙ্গনের টান ভোলেনি।

গাছের ডালে আমাদের পূর্বপুষ দম্পতিদের খুঁজলাম। তারা কেউ নেই।

আর্ট কলেজের একেবারে প্রথম দিকে, যখন জবরদখল ক্যান্টিনটাও আমরা পাইনি, তখন আমাদের থাকবার কোনো সংস্থানই ছিল না। বন্ধুর বাড়িতে কতদিন আর থাকা যায়! মুকুল কাছে এসে বলেছিল, সে কসবাতে একখানি ঘর দেখেছে। চান করার বাথম নেই, তবে কুয়ো আছে। ভাড়া অনেক চাইছে, ওর একার পক্ষে থাকা সম্ভব নয়। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'কত'? মুকুল বলেছিল 'কুড়ি টাকা মাসে'। আর একজন সঙ্গী হলে ভালো হয়। আমি সঙ্গী হয়েছিলাম।

মুকুল দু-চার খানা প্রাণের কথা বলে, সবে মঞ্চ থেকে নেমে এসেছে। আনন্দে উত্তেজনায় এবং বয়েসের ভারে কাঁপছে থর থর করে। দূর থেকে তাকে দেখে, এগিয়ে গেলাম। হালকা পালকের মতোন বয়ে গেছে আট থেকে ঘাট। একষট্টিতে এসে যেন থমকে গেছে সময় - সামনে মুকুল।

সেই মুকুল আমায় চিনতে পারেনি - মুকুলের দোষ নেই, সাতষট্টি থেকে দুহাজার সাত, চল্লিশ বছর কেউ কাউকে দেখিনি। মুকুল ধীরে ধীরে কথা বলতো, বলার গতি তার আরও কমেছে। কিন্তু এতটুকুও বদলায়নি গলার স্বর। পরিচয় দিতেই চোখ ছলছল মুকুল জড়িয়ে ধরলো আমাকে, চল্লিশটা অদেখা বছরকে। সুখে দুঃখে বেশ কিছু কাল ছিলাম একসাথে। হারিয়ে গিয়ে ছিল সেই মুকুল। হারিয়ে গিয়েছিল সেই কিছুটা কাল।

অঙ্কুকে পেলাম না। হয়তো ভালোই হয়েছে। অঙ্কু থাক চির কিশোর হয়ে, আমার মনের মাঝে।

অনুষ্ঠান একসময় শেষ হলো। পরদিন রবিবার। ইচ্ছে হলো, ফেলে আসা হস্টেলটিতে একবার যাই। পরদিন সকাল সকাল বেরিয়ে, প্রায় চল্লিশ বছর পর, পৌঁছালাম জোড়াসাঁকোর যদুলাল মল্লিক রোডে। পুরনো স্মৃতিতে চোখ মন সিক্ত হয়ে এলো। এই সেই মণিকাদির বাড়ি, যেখানে এক সময় মাছ ভাত খেয়ে নিয়ে রওনা হতাম কলেজের উদ্দেশ্যে। শুতে হস্টেলে মেস - সিস্টেম আরম্ভ হয়নি তখনও। মণিকাদিরা আদর করে, পিঁড়ি পেতে, মাছ ভাত খাওয়াতেন মাত্র একটাকার বিনিময়ে। কিছু কিছু পরিবারের এটা ছিল অতিরিক্ত আয়ের সুস্থ সংস্থান। এখনও ওরকম বাড়ি আছে কিনা, জানি না। অনেক পরিজনহীন মানুষদের মণিকাদির মতোন দিদিরা মাত্র একটাকাতে পেটভরে খাইয়ে, অতিরিক্ত দুটো-পয়সা সংসারে সাহায্য করতেন।

ঐ তো দিনুকাকার চায়ের দোকান! দোকানটা যেমন ছিল, আজও তেমনই আছে। দিনু কাকাকে দেখতে পেলাম না। ঐসেই দুলু মহান্তির লুচির দোকান। বিকেলে কলেজ থেকে ফিরে যেখানে খিদে মিটিয়ে নিতাম। একশো গ্রাম লুচি চার আনা, তরকারিফ্রি। দোকান আগের থেকে সাজানো গোছানো। বৃদ্ধ দুলু মহান্তি এখনও বসে। আমায় কি চিনতে পারবে? মল্লিকদের রাজবাড়ির সারা গায়ে এখনও আগর মতোই অরক্ষণের চিহ্। বাগানে শ্বেতপাথরের মূর্তিগুলো ধুলে

া মলিন। বিশাল বাগানটা ঝোপ-জঙ্গলে ভরা। কলকাতা কলকাতাতেই রয়ে গেছে। হস্টেল বাড়িটার কাছে এসে পৌঁছলাম একসময়। যদুলাল মল্লিক রোড এবং পাথুরিয়া ঘাটা স্ট্রীটের সংযোগস্থলে ছিল আমাদের হস্টেল বাড়িটি। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের সেই পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রীট। যেখানে থাকতে 'কিরণময়ী'।

হস্টেলের সামনে এসে দাঁড়ালাম কিছুক্ষণ। এতবছর পরেও কিছুই বদলায়নি চারতলা বাড়িটির। কোলাপ্সিবেল গেটখানাপেরিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। আগে একজন নেপালি দারোয়ান থাকতো। কাউকে দেখতে পেলাম না আজ। সিঁড়ি বেয়ে এক পা এক পা করে উঠতে লাগলাম। কাঠের রেলিং দেওয়া সিঁড়ি। তাই ধরে ধরে উঠে এসে দাঁড়ালাম চ ারতলার কোণের দিকে, আমার ঘরটির সামনে। এই ঘরটিতে প্রায় পাঁচ বছর কাটিয়েছি। উঠতে গিয়ে হাঁপ ধরে গেল। যখন ছাত্র ছিলাম, উঠে যেতাম এক দৌড়ে। দরজায় টোকা দিতে, একটি ছেলে দরজা খুলে দাঁড়ালো। আমার পরিচয় পেয়ে ছেলেটি আপ্লুত। গতকালের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে সেও ছিল। বললাম, এই ঘরটিতে আমি থাকতাম। ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসালো সে আমায়। আমার চোখ ছুঁয়ে ছুয়ে দেখতে লাগলো সারা ঘর। অনেক প্রাণের কথা হলে া ছেলেটির সাথে। অনেক পুরনো কথা মনে পড়ল। ছেলেটির নাম স্বরূপ। "আমি একটু চায়ের ব্যবস্থা করি।"বলে স্বর ূপ বেরিয়ে গেল ছুটে। আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম ব্যালকনির দিকে। গ্রীষ্মের কত রাত্রি কা টিয়েছি এ ব্যালকনিতে শুয়ে। হঠাৎ চোখে পড়ল, কষ্ঠে মহারাজের উপহার দেওয়া খয়ের কাঠের সেই প্রকান্ডতবলাখ ানা ব্যালকনির এক কোণে রাখা আছে। চামড়া ফেটে গেছে। তাতে মাটি ভরে কেউ একখানি চন্দ্রমল্লিকার গাছ লা গিয়ে দিয়েছে। ফুলও ফুটেছে গাছটিতে।